সংকট, সংলাপ ও আসন্ন ইসলামী জাগরণ

মাওলানা আবদুর রাজ্জাক (দা.বা.)

সংকট

লিখনীকে যারা জীবিকা নির্বাহের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছেন বা যারা মতান্ধ হয়ে লেখেন, জীবন-জীবিকার তাগিদে বা স্ব-মতের পক্ষে নির্দ্বিধায় জাতীয় দৈনিকে লিখে যাচ্ছেন তাদের কেউ সরকারের পক্ষে বিবেকের দুয়ার বন্ধ করে লিখছেন, কেউ লিখছেন বিরোধী দলের পক্ষে স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধির জাত মেরে। আমরা যারা দেশ ও দশের কথা লেখি, লেখার মানষিকতা রাখি তারা পড়েছি বিপাকে, সংকটের আবর্তে। দেশ-জনতার কাতারে আছি বলে আমরাও হচ্ছি দেশ-জনতার মত ক্ষত-বিক্ষত ও আক্রান্ত।

বিরোধী দলের পেট্রল বোমায় জ্বলসে যাওয়া মাজলুম জনতার বিষয়ে লিখবো, না সরকারের দমন-পীড়ন ও গুলি করে মানুষ হত্যার কথা লিখবো? সাধারণ ফ্যামেলির কোন সদস্যকে বোমা হামলায় ব্যবহারের কথা লিখবো, না প্রশাসন ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে ক্ষমতার কুরসি টেকানোর কাজে ব্যবহারের কথা লেখবো? দেশকে ধ্বংস করে যারা ক্ষমতায় যেতে চায় তাদের কথা লেখবো, না অবৈধভাবে যারা ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরেছে তাদের কথা লিখবো?

সারা দেশে সহিংসতায় হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে, সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে। এ অবস্থায় দেশবাসীর সামনে যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে তা হলো এ সহিংসতার শেষ কোথায়? পেট্রল বোমায় একের পর এক নিরীহ মানুষ দগ্ধ হচ্ছে। ২৩ জানুয়ারী সারা দেশে এক দিনেই পেট্রল বোমায় দগ্ধ হয়েছে ৪৪ বাসযাত্রী। সহিংস ঘটনায় বর্তমানে দেশে কী পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে তা বার বার জানানো হচ্ছে। সহিংসতার কারণে প্রান্তিক কৃষকরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

২৯ জানুয়ারী দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার রিপোর্টে দেখা যায়, টানা ২৪ দিনের অবরোধে ও হরতালে দেশের অর্থনীতির ক্ষতি সাড়ে ৫৪ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। পাঁচটি খাতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে। পরিবহণে ৭ হাজার ২৪৮ কোটি, ক্ষুদ্র দোকানীদের ৭ হাজার ২শ কোটি, কৃষি খাঁতে ৬ হাজার ৯১২ কোটি, শিল্প খাতে ৫ হাজার ২৫৫ কোটি ও পোষাক খাতে ক্ষতি ৫ হাজার ১৬০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

৩-২-১৫ দৈনিক প্রথম আলোর রিপোর্টে দেখা যায় অবরোধের ২৯ দিনে নিহত হয়েছে ৪৬ জন। পেট্রল বোমা ও আগুনে ২৪ জন, সংঘর্ষে ১০ জন, অন্যান্য ১২ জনসহ ৪৬ জন। ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে আরো ৮ জন। আগুন দেয়া হয়েছে ও ভাংচুর করা হয়েছে ৮৮৬ টি যানবাহনে। রেলে নাশকতা চালানো হয়েছে ৯ দফা। ঢাকা মেডিকেল বার্ণ ইউনিটে ভর্তি হয়েছে ১০২ জন।

রাজনৈতিক অস্থিরতায় দেশের অর্থনীতির সম্ভাবনাকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ব্যাংকের গভর্ণর ড. আতিউর রহমান। ২৯ জানুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ‘জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে’ মুদ্রানীতি ঘোষণাকালে তিনি একথা বলেন।

কেউ কেউ ২০ দলীয় জোটের অবরোধের ভয়াবহতা দেখে স্মরণ করছেন লেলিনগ্রাদ অবরোধকে। ইতিহাসে আলোচিত অবরোধগুলোর অন্যতম অবরোধ হলো লেলিনগ্রাদ অবরোধ। হতাহত ও ক্ষয়-ক্ষতির দিক থেকেও এটি ভয়বহতম অবরোধ। এ সংক্রান্ত তথ্যগুলো গা শিউরে ওঠার মত। ১৯৪১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৪ সালের ২৭ জানুয়ারী পর্যন্ত মোট ৮৭২ দিন স্থায়ী ছিলো এ অবরোধ। এতে প্রাণ হারায় প্রায় ৮ লাখ মানুষ। মতান্তরে ২৫ লাখ। আরো প্রায় ১৪ লাখ মানুষ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এদের অনেকেই ক্ষুধা ও বোমা হামলায় মারা যায়।

বিজিবি প্রধানের দেখা মাত্র গুলি করার হুশিয়ারি, পুলিশি হামলা, মামলা, গ্রেপ্তার এবং বিরোধী দলীয় ভয়াবহতম অবরোধ সব মিলিয়ে দেশ এক মহা সংকটের আবর্তে নিপতিত।

সংকটের জন্য দায়ী কে?

প্রচার প্রোপাগান্ডা চালিয়ে জনগণের সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিকে ভোঁতা করে রাখা সব সময়ের জন্য সম্ভব নয়। ভুয়া নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জবরদস্তি ক্ষমতায় থাকা একটি সরকারকে মেনে নেবার কোন সাংবিধানিক বা নৈতিক যুক্তি থাকতে পারে না। দেশের প্রধান একটি রাজনৈতিক দলকে নির্মূল করবার অবাস্তব রাজনীতির থেকেই বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব। এটা পরিস্কার!

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ডেলিগেশানের ভাষায় "সেটা গোড়ার স্বাধীনতা। যার মধ্যে রয়েছে, কথা বলার স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা, চলা ফেরার স্বাধীনতা। এই গোড়ার স্বাধীনতা নাগরিকদের অধিকার। কিন্তু বাংলাদেশে এই নুন্যতম অধিকার লংঘিত হচ্ছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলকেই এ অধিকার মান্য করতে হবে"। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ডেলিগেশান তাই দুই পক্ষকেই সতর্ক করেছেন। দুই পক্ষকেই সংযত হতে বলেছেন।

ব্রিটিশ এমপিদের জন্য হাউস অব কমন্সের তৈরী করা বাংলাদেশ সংক্রান্ত 'পলিটিক্যাল ক্রাইসিস ইন বাংলাদেশ' জানুয়ারী ২০১৫ আপডেট' শীর্ষক এক স্ট্যান্ডর্ড নোট। তাদের বিশ্লেষণে বর্তমান পরিস্থিতির ব্যখ্যা হলো, বাংলাদেশের রাজনীতির অবস্থা সব সময় যেমন গোলমাল ছিলো এখনও, তেমন। তাদের রিপোর্টে বলা হয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট হলো 'ব্যটলিং বেগাম' অর্থাৎ দুই বেগামের ঝগড়া।

তবে হাউস অব কমন্স ২০১৪ এর পাঁচ জানুয়ারীর নির্বাচনকে বলেছে যার পরনাই ত্রুটিপূর্ণ। এমন এক ভাঁওতাবাজির নির্বাচন যার কোন সীমা-পরিসীমা নাই।

হাউস অব কমন্সের গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষণ হচ্ছে এই ধরণের অচলাবস্থায় 'সার্কিট ব্রেকার' হিসাবে বাংলাদেশের সেনাবাহীনি যে ভুমিকা পালন করে সেই ভুমিকায় তাদের আসবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা। হাউস অব কমন্সের স্ট্যান্ডার্ড নোটে বলা হয়েছে "বর্তমান পরিস্থিতিতে খালেদা জিয়া আবারো সেনাবাহীনির হস্তক্ষেপ কামনা করছেন এমনটি কেউ কেউ মনে করলেও সেনাবাহীনি সে রকম কিছু করবে তা এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছেনা"।

হাউস অব কমন্সের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, গণতন্ত্রের প্রশ্নে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া দুইয়ের কারো উপরই যে নির্ভর করা যায় না, সেটা পরিস্কার কথা।

এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "সরকার র‍্যাব, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও পুলিশের সমন্বয়ে ১৫ জানুয়ারী থেকে 'যৌথবাহীনি মোতায়েন করে বিরোধী রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। এর আওতায় দেশের উত্তরাঞ্চলে বাড়ি-ঘর ও দোকান-পাট গুঁটিয়ে দেয়া হয়েছে। এ দমন ও পীড়নের কারণে নারী ও শিশুসহ শত শত লোক বাড়ি-ঘর ছাড়া হয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এবং ক্ষমতাসীন রাজনীতিকেরা এই অজুহাতে দমন-পীড়ন বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করছেন যে, এর মাধ্যমে সহিংস হামলাকারীদের রক্ষা করা হচ্ছে"।

অ্যামনেস্টি ইন্টার ন্যাশনাল এর বিবৃতিতে বলা হয়েছে-"বিরোধী দলের অবরোধ কর্মসূচির কারণে রাজপথের সহিংসতায় জীবনহানী ঘটছে এবং মানুষ আহত হচ্ছে। ঠিক এ সময় এসব সন্ত্রসী কর্মকান্ডের কোনরূপ প্রমাণ ছাড়াই বিরোধী দলের নেতাদের আটক করা হয়েছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমের সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদকদের সরকারের পক্ষে যায়না এমন প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য হেনস্তা চলছে। নিরাপত্তা বাহীনিও বোমা বহনকারীদের দেখা মাত্র গুলি করার কথা বলছে। আন্তর্জাতিক অপরাট ট্রাইবুনাল (আইসিটি) আদালত অবমাননা আইসিটি এমনভাবে ব্যবহার করছে যাতে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব হয়।

সংলাপ

দেশে চলছে এখন এক ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকট। এ সংকটকে কেন্দ্র করে দেশে চলছে ভয়াবহ সন্ত্রাস। এ সংকটের জন্য সরকার দায়ি করছেন বেগম খালেদা জিয়ার ২০ দলীয় জোটকে। অপর দিকে ২০ দলের অভিযোগ সরকারই ২০ দলীয় জোটের আন্দোলনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। পরিকল্পিতভাবে যানবাহনে আগুন দিয়ে মানুষ পোড়াচ্ছে।

এমনি পরিস্থিতি সম্প্রতি দেশে চলমান নাশকতা বন্ধের পাশাপাশি এর রাজনৈতিক সমাধান বের করতে সরকারের প্রতি সংলাপের আহ্বান জানিয়েছেন মুদ্রন ও অনলাইন গণমাধ্যমের সম্পাদকেরা। তথ্য মন্ত্রণালয়ে সরকারের সিনিয়র মন্ত্রীদের সাথে বৈঠকে তারা এ আহ্বান জানান। শুধু সম্পাদকদের পক্ষ থেকেই সংলাপের তাকীদ এসেছে তা নয়। বলা যায় দেশী-বিদেশী সুশীল সমাজসহ বিশিষ্ট ব্যক্তি, সরকারের বাইরের সব রাজনৈতিক দল, গোটা মানবাধিকার সংস্থা, বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকেও বারবার এসেছে এবং আসছে।

এমনকি ১৪ দলীয় জোটের পাঁচটি শরীক দল এ জোটের সভায় সংলাপের পক্ষে মত দেয় বলে গণমাধ্যমের খবরে প্রকাশ হয়েছে। এমনকি সরকারের শরীক দল জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদও দুই নেত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছেন সংলাপে বসার জন্য। সাবেক প্রেসিডেন্ট বি চৌধুরীও আলটিমেটাম দিয়েছে দুই নেত্রী সংলাপে না বসলে অনশন করবেন। কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দীকি সংলাপের দাবীতে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টকে সংকট নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বারবার আহ্বান করে যাচ্ছে। গত ২৯ জানুয়ারী সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এক খোলা চিঠিতে সংকট নিরসনে ৮ দফা দাবী এবং ২৬ জানুয়ারী সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ৫ ফেব্রুয়ারী যাত্রাবাড়ী থেকে গাবতলী এবং ৮ ফেব্রুয়ারী জেলায় জেলায় ও ১৩ ফেব্রুয়ারী সকল উপজেলায় সাদা পতাকা নিয়ে মানব বন্ধন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৮ দফা দাবীতে এটাও উল্লেখ করেছে যে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, জাতীয় সংহতি ও কার্যকর জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠাকল্পে সংসদ নির্বাচনে বিকল্প পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে। জনগণ ভোট দিবে দলকে, কোন ব্যক্তিকে নয় এবং ভোটের আনুপাতিক হারে দলগুলো আসন বরাদ্দ পাবে। যার ফলে কালো টাকা, পেশী শক্তি, ভোট কারচুপি বন্ধ হবে। দলের আদর্শ ও নেতাকর্মীদের সততা ও যোগ্যতা বিবেচনা করে জনগণ নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারবে।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দেশের স্থায়ী শান্তি ও কাঙ্খিত মুক্তির জন্য ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ কারণে দলটি ৮ দফা দাবীতে আরো বলেছে, সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা ইসলাম এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ সা. এর আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশ দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও দারিদ্রমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। চলমান জাতীয় সংকট উত্তরণে একটি জাতীয় ঐকমত্যের সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছেন বিশিষ্ট রাষ্ট্র বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ। তিনি বলেছেন, এই সরকারের প্রধান কাজ হবে প্রজাতন্ত্রের সব কর্মকান্ড যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সবার অংশগ্রহণমূলক একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান। বিশ্বাসযোগ্য, সচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনই জাতিকে বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণে জাতিকে সহায়তা করতে পারে। ২৮-১-১৫ ইং দুপুরে সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবি সমিতির শহীদ শফিউর রহমান মিলনায়তনে সুশীল সমাজ ব্যানারে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সংকট নিরসনে সংলাপের কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।

নিরিক্ষণ

সংকট নিরসনে সংলাপে বসার জন্য যারা আহ্বান করেছেন তারা সকলেই জ্ঞানী-গুনী, রাষ্ট্র বিজ্ঞানী। তাদের এই প্রস্তাবে সরকার ও বিরোধী দল যদি সাড়া দেয় তাহলে সাময়িকভাবে অবরোধ কর্মসূচি স্থগিত হতে পারে। দমন-পীড়নও সাময়িক বন্ধ হতে পারে। কিন্তু দুটি দল স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার যে খেলায় মেতে ওঠেছে, মরণকামড় দিয়ে যাচ্ছে এর স্থায়ী সমাধান কী হতে পারে? সেটাও তো বিবেক খাটিয়ে বলতে হবে। যেখানে সরকারী দল মনে করে প্রধান বিরোধী দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার অর্থ হলো তাদের ক্ষমতা হারানো। সেখানে তারা সংলাপে বসে কি এতটুকু ছাড় দেবে, যতটুকু ছাড় দিলে তাদের পুনরায় ক্ষমতায় আসার সম্ভবনা ক্ষীণ হয়ে পড়ে? আর বিরোধী দলও কি এতটুকু মেনে নেবে, যতটুকু মেনে নিলে যেনতেনভাবে একটা নির্বাচন দিয়ে অবৈধ সরকার নিজেদের বৈধ করে নিবে?

যদি আমরা মেনে নেই যে, উভয় দল সংলাপে সম্মত হলো, সংলাপ হলো, নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হলো আর এর মাধ্যমে বর্তমান ক্ষমতাসীনরা পুনরায় ক্ষমতায় আসলো তখন বিরোধী দলের অবস্থা কী হবে? কী হবে দেশ জনতার অবস্থা?

আর যদি বিরোধী দল ক্ষমতায় আসে তাহলে কি তারা পারবে প্রতিশোধ নেয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখতে? পারবে কি দুর্নীতি-দুঃশাসন থেকে দেশ জনতাকে মুক্ত করতে? তারাইতো বিশ্ব দরবারে দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ান খেতাবে ভুষিত করেছিলো। আর বর্তমান ক্ষমতাসীনরা বিরোধী দলে গিয়ে দীর্ঘ মেয়াদী অবরোধ কর্মসূচির মাধ্যমে পুনরায় সংকট সৃষ্টি করবে না তার কি গ্যারান্টি?

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর পীর সাহেব চরমোনাই, নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তনের যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা চলমান সংকট নিরসনে তুলণা মূলক সহায়ক বিবেচনা করা যায়। এতে জোটের রাজনীতি পরিহার করে সবাই নিজ নিজ দল নিয়ে ভাববে। এবং প্রতিপক্ষের সহায়ক ভেবে কোন দলকে নিধন করার প্রয়োজনবোধও করবে না। নির্বাচন পরবর্তি উদ্ভট সংকটও আশা করা যায় সৃষ্টি হবে না। তবে দেশের স্থায়ী শান্তি ও কাঙ্খিত মুক্তির জন্য ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের বিকল্প নেই। বর্তমানেও সৌদি আরবসহ যেসব মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামের কিছু কিছু বিধান প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ইসলামের কিছু কিছু বিধানমতে বিচারকার্য পরিচালিত হয়, সেসব দেশ তুলনামূলকভাবে শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়ে যাচ্ছে।

যে ইউরোপ-আমেরিকা আমাদের গণতন্ত্রের সবক দিয়ে যাচ্ছে তাদের দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা কতটুকু আছে, সেটাও একটু ফরক করে ভেবে দেখার সময় এসেছে। ভিন্ন রাষ্ট্রের উপর তাদের নগ্ন হস্তক্ষেপ ও নির্যাতন-নীপিড়নের চিত্র দেখলে গা শিউরে ওঠে, হৃদয়যন্ত্র কেঁপে ওঠে। গণতন্ত্রের বুলি কপচানেওয়ালারা আমাদের দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া তো দূরের কথা বরং তারাইতো গোটা বিশ্বের অশান্তি ও অবিচারের মূল হোতা।

আমাদের দেশে সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা কথায় কথায় গণতন্ত্র চর্চার কথা বলেন, অথচ তারা একটুও ভেবে দেখেনা যে, গণতন্ত্রের চর্চা করতে করতে যদিও আমরা ইউরোপ-আমেরিকার মত হয়ে যাই তাহলেও কি দেশময় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে? আর আমরা যারা মুসলমান, আমাদের যাদের জীবন ইসলাম-মরণ ইসলাম তারা কী এমন কামণা করতে পারি যে, আমাদের দেশ ইউরোপ আমেরিকার মত কোন একটি দেশে পরিণত হোক?

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ অনেকে প্রেসিডেন্টকে বর্তমান সংকট নিরসনের জন্য আহ্বান জানালেও তিনি এখনও পর্যন্ত কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এটাও আশা করা যায় না। কারণ তিনি দলের সিদ্ধান্তের বাইরে যাবেন না। অবশ্য এটা নতুন কোন বিষয় নয়। অতীতে একজন প্রেসিডেন্টকে শুধু মাত্র মাজার যিয়ারত না করার অপরাধে বিদায় নিতে হয়েছিলো। এটাই বাংলাদেশের সংস্কৃতি।

সংকট নিরসনে প্রস্তবনা

১. কায়েমী স্বার্থবাদি দুটি দল ও তাদের সহযোগীরা দেশ ও জনতাকে শান্তি ও মুক্তি দেবে না, দিতে পারবে না। কারণ তারা দেশ ও জনগণের স্বার্থের ওপর তাদের ক্ষমতাকে প্রাধান্য দেয়। এজন্য তাদের বাদ দিয়ে তৃতীয় কোন চিন্তা করা।

২. মনবতার মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি কুরআন-সুন্নাহ এবং মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী সা. এর আদর্শ। সেই বিধান ও আদর্শ বাস্তবায়নের সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

৩. তৃতীয় ধারা সৃষ্টি করার জন্য সহীহ ধারার ইসলামী সংগঠন ও হক্কানী উলামা-মাশায়েখদের বিকল্প নেই। সেজন্য উলামা-মাশায়েখ এবং সহীহ ইসলামী সংগঠনগুলোর মজবুত ঐক্য গড়ে তোলা।

৪. কায়েমী স্বার্থবাদিদের পতন ঘটাতে হলে গণ আন্দোলনের বিকল্প নেই। তাই জনগণকে সচেতন করে গণ আন্দোলনের ডাক দেয়া।

৫. গণ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে জুমার দিন মসজিদে মসজিদে দেশের সংকট, সংকটের স্থায়ী সমাধান যে একমাত্র ইসলাম এ বিষয়ে জ্ঞানগর্ব ও যৌক্তিক বক্তব্য দেয়া।

৬. মাদরাসার বার্ষিক মাহফিল, তাফসীর মাহফিল, সীরাত সম্মেলন ও ইসলামী সম্মেলনগুলোতে ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্যাবলি তুলে ধরা।
৭. সহীহ ধারার ইসলামী সংগঠনের পক্ষ থেকে উলামায়ে কেরামের সঙ্গে মতবিনিময় করে এ কথা বোঝানো যে, জাতীয় সংকট নিরসন ও গণমানুষকে কায়েমী স্বার্থবাদি গোষ্ঠী থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে আলেম সমাজের দায়িত্ব রয়েছে।
৮. চলমান সংকটের বাস্তবতা যেহেতু সব শ্রেণী-পেশার মানুষ স্বীকার করছে এবং এই বিষয়ে সকলেই উদ্বেগ প্রকাশ করছে তাই সব শ্রেণী-পেশার মানুষের সঙ্গে মত বিনিময় করে তৃতীয় অবস্থান সৃষ্টির যৌক্তিকতা ও বিকল্প নীতি হিসেবে ইসলামী বিধানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তুলে ধরা।

আসন্ন ইসলামী জাগরণ নিয়ে বিভ্রান্তি

বর্তমান সংকট নিরসন ও দেশবাসীর স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে ইসলামী জাগরণ অনিবার্য। মানুষ যে ইসলামের পক্ষে জাগছে এর নমুনাও বিভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে ইসলামের পক্ষে গণমানুষের সত্যিকারের জাগরণকে কেউ কেউ ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করছে এবং বিভ্রান্তির বেড়া জালে আঁটকে দিচ্ছে। এমনি একটি প্রতিবেদন দৃষ্টিতে পড়েছে ২৯-১-১৫ এর দৈনিক ইনকিলাবে। ইনকিলাবের প্রথম পাতায় জনাব স্টালিন সরকারের "দেশে ইসলামী জাগরণ আসন্ন" শিরোনামে প্রতিবেদনটি ছাপা হয়। প্রতিবেদনে তিনি ইসলামী জাগরণের যে তথ্য পেশ করেছেন তাতে আমাদের কিছু আপত্তি রয়েছে। তার প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ হলো-
১. ইসলামী সভা-সমাবেশ এবং ওয়াজ মাহফিলগুলোতে মানুষের উপচে পড়া ভিড়।
২. আরাফাত রহমান কোকোর জানাজায় লাখো মানুষের সমবেত হওয়া এবং ঢাকার বাইরে সহস্রাধিক গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়া।
৩. আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত এবং ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া।
৪. ঢাকার নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে দীন ও শরীয়ত মেনে চলার প্রবণতা।
৫. নামাজের সময় মসজিদগুলোতে মানুষের উপচেপড়া ভিড়।
৬. অবরোধকারী এবং অবরোধ প্রতিহতকারীরা অর্থ ছাড়া সফল করতে না পারলেও পীর মাশায়েখরা সভা-সমাবেশ, ওরশ ইত্যাদি অর্থ ছাড়াই সফল করছে।
৭. ইসলামী মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবাদি বিশ্বসীদের প্রতি মানুষের জোঁক বাড়ছে।

পর্যালোচনা

ইসলামী সভা-সমাবেশ ও ওয়াজ মাহফিলগুলোতে লোকসমাগম বেশী হওয়া, মসজিদে মসজিদে মানুষের উপচেপড়া ভিড় হওয়া, ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া, ঢাকার নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মাঝে ইসলামী নিয়ম-নীতি নেমে চলা-ফেরা করার প্রবণতা এটা অবশ্যই ইতিবাচক দিক। কিন্তু ইসলামের প্রতি মানুষের এই উৎসাহ উদ্দীপনাকে তথাকথিক ইসলামী মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবাদি বিশ্বাসীদের পক্ষে জাগরণ হিসেবে বিবেচনা করা কায়েমী স্বার্থবাদি দু'দলের কোন এক দলের পক্ষে সমর্থণ জানানোর নামান্তর।

আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, দেশের যেসব ওয়াজ মাহফিলগুলোতে ইসলামী হুকুমতের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্যাবলি তুলে ধরা হয়না। দুর্নীতি-দুঃশাসনের বিরুদ্ধে

বক্তব্য আসেনা। পূর্ণাঙ্গ ইসলামের প্রতি নির্দেশ করা হয়না। তাগুতী শাসনব্যবস্থার উপর ইসলামকে বিজয় করার ঘোষণা আসেনা। পুজিবাদি অর্থনীতি বাদ দিয়ে ইসলামী অর্থনীতির সুফল বর্ণনা করা হয়না সেসব ওয়াজ মাহফিল ইসলামী জাগরণের ক্ষেত্র হতে পারে না। কেবল যেসব মাহফিলে এসব বিষয়ে বক্তব্য আসে সেগুলোই একমাত্র ইসলামী জাগরণের কেন্দ্র। মজার বিষয় হলো, যে সব মাহফিলে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের নির্দেশ করা হয়। দুনীতি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়া হয়, সেসব মাহফিলের যারা আয়োজক, যারা বক্তা তারা কিন্তু তৃতীয় ধারা সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত। অতএব তাদের এ জাগরণকে জাতীয়তাবাদি আদর্শের জাগরণ বলে চালিয়ে দেয়া বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেক মাহফিলতো এমনও আছে যেগুলোতে ইসলামী রাজনীতির বিরুদ্ধেও বক্তব্য হয়, নাস্তিক বিরোধী আন্দোলনকে কটাক্ষ্য করা হয় সেগুলো কিভাবে ইসলামী জাগরণের উৎস হতে পারে।

জনাব স্টালিন সরকার উরস এবং আরাফাত রহমান কোকোর জানাজাকে ইসলামী জাগরণ হিসেবে বিবৃত করেছেন। অথচ এটা যে ইসলামী জাগরণের বিষয় নয় এটাতো ইসলাম সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞান যাদের আছে তারাও বোঝেন। স্টালিন সরকার সাহেব এটা কেন বোঝলেন না? আসলে তিনি নিজেও বোঝেন, তবে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের সুযোগটা হাত ছাড়া করতে চান না।

প্রকৃত ইসলামী জাগরণ

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি, ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন, ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন তথা পীর সাহেব চরমোনাই কেন্দ্রীক তৃতীয় ধারার একটি প্রকৃত ইসলামী জাগরণ হচ্ছে, এটা এখন আর অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর, নায়েবে আমীর, মহা-সচিবসহ এ ধারার আরো অনেক বক্তা বছরের প্রতিদিন দেশের কোন না কোন জেলা ও উপজেলায় একাধিক মাহফিল ও সমাবেশ করে যাচ্ছেন, যা সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলার সর্ববৃহত দীনি মাহফিল ও সমাবেশে রূপ নিচ্ছে। প্রতিটি বিভাগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে চরমোনাই বার্ষিক মাহফিলের নমুনায় সে বিভাগের সর্বাধিক বড় মাহফিল। এসব মাহফিলে মানুষের উপচেপড়া ভিড় ও প্রাণবন্ততা পরিলক্ষিত হচ্ছে। পূর্ণাঙ্গ ইসলামের নির্দেশসহ দুর্নীতি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বক্তব্য বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছেন এসব মাহফিলের বক্তারা। চরমোনাইর তিন দিন ব্যাপী মাহফিল একক কোন ইসলামী দলের সর্ববৃহৎ মাহফিল। এই মাহফিলে যারা যোগদান করছেন তাদের আমূল পরিবর্তন ঘটছে। তারা আত্মশুদ্ধির দীক্ষা নিচ্ছেন শুধু তাই নয় বরং জিহাদী প্রেরণায়ও উজ্জীবিত হচ্ছেন। ইসলামী শ্রমিক আন্দালনের নামে শ্রমিকদের মাঝেও সচেতনতা সৃষ্টির কাজ চলছে গতিশীল ভাবে। ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে দেশের তিনটি ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী বিপ্লবের জন্য যোগ্য নেতৃত্ব তৈরীর কাজও চলছে অব্যাহত গতিতে। অতএব বলা যায়, দেশে যে আসন্ন ইসলামী জাগরণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে তা একমাত্র হযরত পীর সাহেব চরমোনাই এর নেতৃত্বে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ব্যানারেই উত্থিত হবে। নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন হলে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নিজস্ব শক্তি প্রদর্শন ও প্রমাণ করার সুযোগও পাবে। ইনশাআল্লাহ।

লেখক-

বিশিষ্ট আলেমে দীন, গবেষক, প্রান্ধিক ও কলামিস্ট

• লেখাটি ইশা ছাত্র আন্দোলন-এর দ্বিমাসিক মুখপাত্র **'ছাত্র সমাচার'** জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি'১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত।